নির্জ্জন গৃহকোণে

এই লেখকের লেখা—

স্বর্গ হইতে বিদায়—১॥০

বিপ্লবী যৌবন—৩৲

যথা পূর্ব্বং—(যন্ত্রস্থ)

নির্জ্জন গৃহকোণে

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

নির্জ্জন গৃহকোণে

প্রথম সংস্করণ

বৈশাখ ১৩৪৮

সর্ব্ব স্বত্ব গ্রন্থকারের

দেড় টাকা

শ্রীধীরেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১৯, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত
ও শক্তি প্রেস, ২৭।৩বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীআশুতোষ ভড় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল

বন্ধুবরেষু—

১লা বৈশাখ, ১৩৪৮

শ্রী ভবানী মুখোপাধ্যায়

নির্জ্জন গৃহকোণে

সকাল হয়েছে বটে, রবিরশ্মি কিন্তু এখনও মলিনার ঘরে প্রবেশ করেনি। নদীবক্ষে, বালুকাস্তূপে, পথে প্রান্তরে সর্ব্বত্র সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত। বাগানের গাছের দীর্ঘ ছায়া এসে পড়েছে জানালার সার্সীতে, মলিনার ঘরে তাই আলো নেই।

মধ্যাহ্নে সূর্য্য যখন মধ্য গগনে, তখন সেই ঘরে ক্ষণকাল বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে অজস্র আলো, মেঝের ধূলিকণাগুলি পর্য্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, প্রাচীরের ওপর থেকে টবের গাছগুলির ছায়া ইতস্ততঃ ভেসে বেড়ায়।

কিন্তু কতক্ষণ, ঘূর্ণ্যমানা পৃথিবী, সূর্য্য সরে যায়, দেয়ালে মেঘের ছায়া ক্রমশঃ প্রসারিত হয়। লাল, নীল, ধূসর কত বিচিত্র ছায়া।

গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিনে আকাশ আর মেঘ যখন পাথরের মত কঠিন, আলোর ঔজ্জ্বল্য রূঢ় রুক্ষ হয়ে ওঠে, এ হোল সে দিনের প্রাকৃতিক ইতিহাস।

মেঘাচ্ছন্ন দিনে আকাশ নেমে আসে নীচে—আরও নীচে। প্রভাত, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সূর্য্যাস্তের কোনও রূপ নেই, বৈচিত্র্য নেই, গতি নেই, মেঘভারাক্রান্ত আকাশে সবই সমান। অন্ধকার বেড়ে চলে। দেয়ালের ছবি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসে। সার্সী সারাদিন বন্ধ—বাইরের জোলো হাওয়া ঘরে না আসে, দীর্ঘ নিরবিচ্ছিন্ন প্রদোষান্ধকার সারাদিনকে গ্রাস করেছে।

উজ্জ্বল আর ম্লান—আকাশ নদী বা দিনের এই প্রাকৃতিক ইতিহাসই মলিনার জীবনের সবচেয়ে বড় কথা, মলিনার অস্তিত্ব যেন আবহাওয়ার সংবাদে দাঁড়িয়েছে। টেম্পারেচার-চার্ট জীবনের একমাত্র পরিবর্ত্তনশীল বৈচিত্র্য।

স্বল্পপরিসর ঘরের এক প্রান্তে মলিনার রোগশয্যা বিছানো, সেখান থেকে জানলা ও দরজা লক্ষ্য করা সহজ। বিছানার উপর সাদা চীনেমাটির বুদ্ধমূর্ত্তি পড়ে রয়েছে, অসুখের সূচনায় শৈলপতি একদিন এটা কিনে এনেছিল। প্রথম প্রথম বাগান থেকে দুচার রকম ফুল তুলে এনে শৈলপতি মলিনার মাথার দিকের টিপয়ে সাজিয়ে রাখ্‌ত, ইদানিং আর সময় হয় না, মাস খানেক আগেকার ফুল ফুলদানিতে শুখিয়ে আছে। সেই টিপয়ের ওপরই এখন জমেছে ওষুধের ছোট বড় নানা রকম শিশি, থার্ম্মোমিটার আর টাইমপীস। মলিনা দিনে অন্ততঃ পনের ষোল বার টেম্পারেচার দেখে, তবু তো একটা কাজ, জ্বর বাড়লে বা কমলেও সে খুসী, সেও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। টাইমপীসটা শৈলপতি সম্প্রতি কিনেছে, সাধারণ টাইমপিস নয়, নতুনত্ব আছে, পিয়ানোর সুরে ঘড়িটা বাজে। আর আছে একটা হাত আরশী, মুখ দেখে দেখে নিজের মুখের সরল, বক্র, কুঞ্চিত রেখাগুলি মলিনার মুখস্থ হয়ে গেছে।

নাম তার মলিনা হলেও বর্ণ তার একদা উজ্জ্বল ছিল, সে হিসাবে তার নাম হওয়া উচিত ছিল সুবর্ণা, কিন্তু ইদানিং অসুখের জন্য মলিনার চেহারা শুধু ম্লান নয়, পাণ্ডুর বিশীর্ণ হয়ে পড়েছে।

এখানকার বড ডাক্তার শশিশেখরবাবু, অন্য কোথাও প্র্যাক্‌টিস করলে হয়তো আরও নাম হোত, কিন্তু এদেশ তাঁর ভাল লাগে তাই

এখানেই সারা জীবনটা কাটিয়ে দেবেন স্থির করেছেন। ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মিতভাবে তিনি প্রতিদিন মলিনাকে দেখে যান, তার উপস্থিতিতে মলিনা পরম প্রশান্তি অনুভব করে, এই শান্তি শুধু মফিয়াতেই সম্ভব। সহসা সে ফিরে পায় জীবনের চাঞ্চল্য, মলিনার অন্তর আনন্দে পক্ষ প্রসারিত করে চেতনাময় যৌবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ে।

গতানুগতিকভাবে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ডাক্তারবাবু মলিনার শয্যাপার্শ্বে বসেন, তারপর গম্ভীরভাবে হাত দেখে নাড়ীর গতি অনুভব ক'রে কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করেন, রাতে ঘুম হয়েছিল? তারপর সেই ব্যথাটা একটু কম ছিল ত? এর পর মলিনার উত্তরের ওপর নির্ভর করে ডাক্তারবাবুর দুটি বাঁধা কথা 'বেশ' কিংবা 'হুঁ', প্রতিদিন একই কথার পুনরাবৃত্তি, কিন্তু সর্ব্বদাই নূতন শক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে মলিনা।

এ সময়টায় শৈলপতি নিয়মিতভাবে ঘরে উপস্থিত থাকে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে উদাসভাবে সিগ্রেটের কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার অন্তরালে নিজের বিচ্ছিন্ন চিন্তাসূত্রের সন্ধান করে, কখনও আবার মলিনার বিছানায় কাছে এসে অসংলগ্ন দুটো একটা কথা কিংবা রসরহস্য করে, হেসে ওঠে, কখনও বা ছোটখাট জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখে। শৈল-পতির এ একটা কাজ। মলিনা কিন্তু ঠিক এ সময়ে তার উপস্থিতিতে আনন্দিত হোত না, মাথার কাছে যেন গুঞ্জনরত মক্ষিকার ভীতিজনক উপস্থিতি। এই অতি-ব্যস্ততার ভাণ তাকে আহত করে।

মেয়েদের মত ক্ষিপ্রতায় শৈলপতি নিজের হাতে সব গুছিয়ে তবে বেরোত, সব কাজ সে এমন সহজভাবে করতো যে মলিনা সময় সময় বিস্মিত হয়ে পড়তো, শৈলপতির কোনো কাজেই ও লাগছে না, এর

জন্য মনে মনে মলিনার অনুশোচনার আর সীমা নেই। দশ বছর ওদের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু এ দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের মধ্যেও শৈলপতির আবির্ভাব মলিনার কাছে প্রথম দিনের মতো নিবিড় অনুভূতির সৃষ্টি করে, শৈলপতির আশঙ্কাকরুণ স্নিগ্ধ স্পর্শের সমুদ্রে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে মলিনা আনন্দময় উদ্দেশ্যহীনতায়। সুদীর্ঘ অন্তরঙ্গতার পরও শৈলপতির ক্ষিপ্র এবং তীক্ষ্ণ দেহবঙ্কিমার দিকে বুভুক্ষিতের মতো চেয়ে থাকে মলিনা, সারা দেহমনে কি সুতীব্র অনুভূতি!

মৃত সন্তানের মুখে দুগ্ধভারাবনত পীবর স্তন দিয়ে মলিনা একদিন হৃদয়ে যে বেদনা অনুভব করেছিল, আজও মাঝে মাঝে সেই বেদনা ওকে বিহ্বল করে তোলে, শরীরের যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ সব আজ ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে।

বুকের ব্যথা একটু কম পড়লেই মলিনা মনে করে এইবার সে সেরে উঠবে, আর কষ্ট পাবে না, কিন্তু কতক্ষণ! অখণ্ড স্তব্ধতার মাঝে নির্জ্জন গৃহের এই নিরালা কোণে শুয়ে মলিনা বুকের চারপাশে রুগ্ন আঙুলগুলি সঞ্চারিত করে একটু শান্ত হতে চায়, কিন্তু ধীরে ধীরে আবার ব্যথায় যন্ত্রনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। যন্ত্রনার বিভীষিকায় ছিন্ন হয়ে যায় মলিনার অন্তর—সারা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন অকস্মাৎ বন্ধনমুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। মলিনা নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে, নড়বার শক্তি নেই। ক্রমশঃ রাহু-মুক্ত চন্দ্রের মতো মলিনার বেদনার প্রকোপ কমে আসে, মলিনা ভাবে, একাকী এই ঘরের নির্জ্জন কোণে এইবার হয়ত সে মরে যাবে, দেয়ালে জ্বলবে প্রখর সূর্য্যালোক, নদীতে বইবে উচ্ছল জোয়ার। যদি সে মরতে পারতো, অন্ততঃ সে এই যন্ত্রণা ও বিভীষিকার হাত থেকে মুক্তি পেত। আর কতদিন!

ব্যথা ক্রমশঃ কমে যায়, নিষ্প্রাণ শক্তিহীন দেহ নিয়ে মলিনা চুপ করে শুয়ে শুয়ে ভাবে, একটা নার্স থাকলে হয়ত ভালো হোত, আজ শৈলপতি এলে বলবে।

সন্ধ্যার পর শৈলপতি ফিরল, উচ্ছ্বসিত উৎসাহে সারা বাড়ি সচকিত করে তোলে—চীৎকার করে ওঠে—কেমন আছো গো রাণী! আজ যা আঙুর পেয়েছি ফার্ষ্টক্লাস।

মলিনার জীবনে যেন সৌভাগ্য-সূর্য্যোদয় হ'ল, সব ভুলে গেল মলিনা, যন্ত্রণার কথা, রোগের কথা, নার্সের কথা। শৈলপতি মলিনার রুক্ষ চুলগুলিতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, আর মলিনা ক্ষীণকণ্ঠে বল্লে —কত কষ্টই না তোমায় দিচ্ছি!

—কষ্ট কি রাণী! তুমি সেরে উঠলেই আমার সুখ। তুমি চুপ করে শোও, একজন বন্ধু এসেছেন, একটু চা-টা করে দিই।

স্তিমিত হয়ে আসে মলিনা। পাশের ঘরের কলহাস্য, কথার ভগ্নাংশ মলিনার কানে ভেসে আসে, কত অবান্তর অসংলগ্ন কথা, ম্যালেরিয়া থেকে মহাযুদ্ধ, কি উত্তেজনা! কিন্তু রুগ্না স্ত্রীর পরিচর্য্যায় যার দিন কাটে তার জীবনে উত্তেজনার উৎসাহ কোথায়, কোথায় পাবে সে অফুরান্ত আয়ু, চেতনাময় যৌবন!

সেদিন সকালে যখন শশিশেখরবাবু এলেন, শৈলপতি তখন কোথায় যেন বেরিয়েছে, সেই অবসরে মলিনা ডাক্তারবাবুকে প্রশ্ন করলে, সেরে ত উঠলাম না; মৃত্যু কবে হবে বলতে পারেন?

ডাক্তারবাবু হেসে বল্লেন—আমি ত মা ভগবান নই, মৃত্যুর কথা কি করে বলি বল?

নির্লিপ্ত কণ্ঠে মলিনা বল্লে—মানে আর কত দেরী ?

স্নিগ্ধ সংযত কণ্ঠে ডাক্তারবাবু বল্লেন—মরণের কথা কেউ কি বলতে পারে, যে কোনো মুহূর্ত্তে তা ঘটতে পারে, কিন্তু অত ব্যস্ত হলে কি চলে মা ?

মলিনা আর কথা কয় না।

তারপর কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত্ত, বারান্দায় যেন মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যায়। শশিশেখরবাবু আবার কথা সুরু করেন, তোমার নার্স রাখার আপত্তিটা ছাড়তে হবে আমি কদিন ধরেই বলছি, এ ভাবে একা একা থাকা ঠিক নয়।

বিস্মিত হোল মলিনা, বললে,—আমার রাজী হওয়া মানে ?

—শৈলবাবু বলছিলেন কি না। তারপর মলিনার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তা হলে তোমার কি আপত্তি নেই মা ?

—আপত্তি ! মানে, হ্যাঁ আপত্তি—কিন্তু আপনি জানলেন কি করে ? তবে যদি দরকার বিবেচনা করেন, তাহলে অবশ্য রাখতেই হবে।

—বেশ আমি আজই ব্যবস্থা করছি, ভাল লোক আছে, আমার জানা লোক।

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন, মলিনা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, শৈলপতি নার্স সম্বন্ধে এ কথা বলেছে কেন ? ওর সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলে ও চটে যায়, কিন্তু মলিনাকে সে সত্যি ভালবাসে, মলিনার অসুখের ব্যাপারে ওর দুশ্চিন্তার আর সীমা নেই।

সেদিনই এক পাত্‌লা রঙীন চাদর কিনে আনলে শৈলপতি, মলিনার গায়ে ঢাকা দিয়ে বললে, ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে কিন্তু, ঠিক যেন বিয়ের দিনের মতো।

কি-ই বা বলবে মলিনা, তবু কিছুক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে বললে, ডাক্তারবাবু বলছিলেন একজন নার্স রাখা দরকার, আজই পাঠিয়ে দেবেন।

একটু চুপ করে থেকে শৈলপতি বললে, বেশ ত। তারপর অনাবশ্যক হাসি হেসে বললে, আমি ঠিক এই কথাই ভাবছিলুম, ভয় ছিল পাছে তুমি অজ্ঞাতকুলশীলার সঙ্গ অপছন্দ কর তাই কিছু বলি নি।

পাঁচটার পর নার্স এলো, সুশ্রী, পরিচ্ছন্ন এবং তরুণী। তার নাম জগৎমোহিনী নয় জয়ন্তী। রীতিমত আধুনিক এবং শিক্ষিতা নার্স। নার্সের আগমনে মলিনা অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগল, রোগের বোঝা এইবার অপরের ঘাড়ে নামিয়ে সে একটু বিশ্রাম করতে পারবে। শৈলপতির সেবা যত্নের পেছনে মলিনার কুণ্ঠামিশ্রিত তৃপ্তি বর্ত্তমান।

এবার সে উপভোগ করবে অকুণ্ঠিত তৃপ্তি। মলিনার চারপাশে নিয়তই দুশ্চিন্তার জাল প্রসারিত, এই নির্জ্জন গৃহকোণের নিঃসঙ্গ পরিবেশ মলিনার কাছে রোগশয্যার চেয়েও ক্লান্তিকর, ব্যথার চেয়েও দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠেছে।

একদিন দুপুরে সদর-দরজায় কড়া নেড়ে উঠেছিল, সেই সময় ব্যথাটা বেড়েছে, যন্ত্রণায় মলিনা ছটফট করছে, অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ার আওয়াজ শোনা গেল, মলিনার ইচ্ছা হোল একবার উঠে দেখে, কিন্তু তার নড়বার শক্তি নেই, চীৎকার করবার সামর্থ্য নেই। মলিনার

মনে হোল, তার বেদনা উপশম করবার জন্যে দোর ভেঙে পাশের বাড়ির লোকেরা ছুটে আসছে। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে এমন সব সম্ভব অসম্ভব কথা মনে পড়তে লাগল যার কোনো মানে নেই, একবার মনে হোল হয়ত শৈলপতি আহত হয়েছে মোটর-দুর্ঘটনায়, ষ্ট্রেচারে করে নিয়ে এসেছে বুঝি তার আহত দেহ! বিপদ ঘটতে কতক্ষণ, এমন তো কত হয়! তারপর, অবশেষে কড়া নাড়ার আওয়াজ থামলো, ধৈর্য্যেরও সীমা আছে। অজ্ঞাত রহস্যে ডুবে রইল মলিনা, কে যে কড়া নাড়লে, তা আর কোন দিন জানা গেল না।

নার্সের আগমনে মলিনা তাই সুস্থ বোধ করেছে, বুকের ব্যথাটা একটু কম পড়েছে যেন, বারে কমেছে। মলিনার আর ভয় করে না। জয়ন্তী বই পড়ে, খবরের কাগজ পড়ে শোনায়, গল্প বলে, মাঝে মাঝে আবার মৃদুকণ্ঠে গান গায়। মলিনাকে ভুলিয়ে রাখে জয়ন্তী—নার্স ও সখীর সমন্বয়। মলিনার নির্জ্জনতার কষ্ট, নিঃসঙ্গের দুঃখের অবসান হয়েছে। সূর্য্যদেবের গতিপ্রকৃতি, নদীর উচ্ছল স্রোতের হিসাব-নিকাশ আর সে তেমন রাখে না। মানুষ ও সমাজের কথা শুন্‌তে মলিনার আবার ভাল লাগে।

মলিনা আবার নতুনভাবে জীবন সুরু করেছে, ভুলে যেতে চায় এই কয়মাসের গ্লানিকর জীবনের ইতিহাস!

নার্সকে মলিনা জয়ন্তী বলেই ডাকে, শৈলপতি কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে মিস্ সেনের নীচে নামতে পারেনি, তার এই অর্থহীন ভদ্রতা মলিনার ভাল লাগে না। মলিনা চায় জয়ন্তীকে আত্মীয়ের মতো করে টেনে নিতে, তার করুণায় সে পুনর্জ্জীবন লাভ করেছে। জয়ন্তীর সংস্পর্শে এসে আজ মলিনার বাঁচতে ইচ্ছা করে, তাড়াতাড়ি সেরে

ওঠবার তার অসীম আগ্রহ। জীবনের যা কিছু রমণীয়, বিছানায় শুয়ে আঙুলের ফাঁকে তা আর গলে যেতে দেবে না মলিনা। শৈলপতির সর্ব্বব্যাপিত্ব ও প্রাধান্য যেন ইদানীং কমে এসেছে, সে আর এখন মলিনার রুগ্ন জীবনের অনিবার্য্য প্রয়োজন নয়, কিন্তু জয়ন্তীর প্রয়োজনীয়তা এখন অপরিহার্য্য।

মলিনা দেখাতে চায় সে যেন সেরে উঠেছে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই ফিরে আসে ব্যথার প্রকোপ। এবারকার আক্রমণ আরো গভীর—আরো ব্যাপক, ফলে মর্ফিয়া দুদিন মলিনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে, এর পর মলিনা আরো ক্ষীণ হয়ে পড়লো। সেরে উঠবার বাসনা ভেঙে গেল, জয়ন্তীকেও আর সব সময় ভাল লাগে না, সেই সময় মলিনার মনে হয়, আর এ জীবনে কি প্রয়োজন, বেঁচে থাকার কোনো মানে নাই।

ক্রমশঃ এ ভাবও কাটলো, আবার জয়ন্তীর কাছে মলিনা শোনে হাসপাতালের গল্প, ডাক্তারের কাহিনী, মেট্রনের মেজাজ, আরো কত কি—মলিনা অবাক হয়ে যায়। ডাক্তার আর নার্স, মলিনার কাছে এদের আসন অনেক উঁচুতে, কিন্তু জয়ন্তীর গল্পে অনেক রহস্যের যবনিকা উঠলো।

শৈলপতির মনে আর তেমন আনন্দ নেই, জয়ন্তী ঘরে থাকলে সে মলিনার কাছে আসতে কুণ্ঠিত হয়, মলিনা মনে মনে ভাবে—ঈর্ষা, শৈলপতি এলে তাই জয়ন্তীকে ইসারা করে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। তারপর শৈলপতি মলিনার লিকলিকে সরু হাতখানা তুলে নিয়ে আদর করে, দুটো মিষ্টি কথা বলে—আশার কথা, সান্ত্বনার কথা। মলিনা শীগগির সেরে উঠবে।

কিন্তু এও বাঁধা ফর্ম্মুলা, মলিনা যে সেরে উঠবে সে বিশ্বাস তার নেই।

আজকাল শৈলপতির জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতার আভাস পাওয়া যায়। গলার আওয়াজ ভারী, প্রকৃতি গম্ভীর হয়ে ওঠে। একবার ফিরে আসে—আবার কোথায় বেরিয়ে যায়, কপালের কুঞ্চিত রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মলিনা সবই বোঝে। বাক্যের অসংযম, ব্যবহারে দীপ্তির অভাব—সবই তার চোখে ধরা পড়ে। তবু সে নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে চুপ করে থাকে।

মলিনার বিরক্তি বেড়ে যায়, জয়ন্তীকে কি শৈলপতি মলিনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চায়। শৈলপতির স্বার্থপরতায় মলিনা যতই উত্তেজিত হয়—ততই তার জয়ন্তীর ওপর নির্ভরতা বেড়ে চলে।

আধো-ঘুম আধো-জাগরণে মলিনার মনে হয়, জয়ন্তী যেন স্বর্গের দেবী, মলিনাকে সুস্থ করবে বলে নেমে আসছে স্বর্গ থেকে, মাথার চার পাশে বিকিরিত স্বর্গীয় জ্যোতির্ব্বন্যা, হাতে অমৃতভাণ্ড, কৃতাঞ্জলিবদ্ধ মলিনা সবিনয়ে অমৃত প্রার্থনা করছে, কিন্তু অদৃশ্য লুতাতন্তুর বাধা অতিক্রম করে কিছুতেই আর জয়ন্তী কাছে পৌঁছতে পারছে না, শৈলপতিই সেই অদৃশ্য সূত্রের এক প্রান্ত ধরে আছে, বিশ্রী চীৎকার করে গাত্রবস্ত্রের ঘনতর সংস্পর্শের কৃত্রিম অন্ধকারে মুখ ঢাকলে মলিনা। জয়ন্তী তাড়াতাড়ি ছুটে এলো, কিন্তু সেই যে মলিনার ঘুম ভাঙলো, কিছুতেই আর ঘুম আসে না, অবশেষে জয়ন্তীকে ঘুমের ওষুধ দিতে হ'ল।

শৈলপতির সেদিন শহরে যাবার কথা, ঘুম ভেঙে মলিনা কিন্তু পাশের ঘরে টুকরো টুকরো কথা শুনতে পেলে, কলহাস্যের উচ্ছ্বাসে কথা মাঝে মাঝে চাপা পড়ে যাচ্ছে। তখনও ঘুমের ঘোর ভাল করে কাটেনি, তবুও ঘুম ছাড়িয়ে কথা কানে ছড়িয়ে পড়ছে। মলিনার দক্ষিণের জানলা দিয়ে নদী দেখতে পাওয়া যায়, নিস্তরঙ্গ শান্ত নদীর দিকে চেয়ে নিস্পন্দ মলিনা ক্ষণকাল চুপ করে পড়ে রইল, কান রইলো পাশের ঘরের নরনারীর গুঞ্জনে। কোনো কথাই স্পষ্ট বোঝা যায়না, তবু পুরুষের কণ্ঠ পরিচিত, শৈলপতির চিরপরিচিত হাসি মলিনার ভোলবার কথা নয়। হাস্যরত শৈলপতির মুখখানি মলিনার স্পষ্ট মনে পড়লো।

প্রকম্পিত হ'ল পৃথিবী, এক মুহূর্ত্তে সব শেষ হ'ল, মূর্ত্তি গেল ভেঙে, সুর হ'ল ম্লান। যে দুজনকে ও বিশ্বাস করে, যাদের ওপর একান্ত অসহায়ের মতো নির্ভর করে আছে মলিনা, তারাই ওকে চূর্ণ বিচূর্ণ করলে। ভীত, চকিত মলিনা উত্তেজনায় উঠে বসলো। রুগ্নকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে উঠলো,—জয়ন্তী, জয়ন্তী, নার্স !

রাজ্যহারা অনাথার আকুল আর্ত্তনাদ।

ছুটে এলো জয়ন্তী, একি আপনি উঠেছেন কেন দিদি ? সে কথার উত্তর না দিয়ে যেন বিকারের ঘোরে মলিনা চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করলে, কে কথা কইছে, ওঘরে ওরা কারা ?

—ও, ওঘরে, ইলেকট্রিকের মিটার দেখতে এসেছিল, চলে গেছে, এই বলে জয়ন্তী দরজাটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিলে। এই দরজার সামনে দিয়েই বাইরে যাবার রাস্তা।

মলিনা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বল্লে—খুলে দাও শীগগির, খুলে দাও দরজা।

পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল, একটু হেসে জয়ন্তী দরজা খুলে দিলে। লোকটি ইতিমধ্যে চলে গেছে।

বিছানা থেকে উঠতে গেল মলিনা, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বুকের ব্যথাটা আবার বেড়ে উঠলো, সেই যন্ত্রণার মধ্যেই মলিনা সদর দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শুনতে পেলে।

জয়ন্তী মলিনার কাছে দৌড়ে এলো, মুখের হাসি তখন মিলিয়ে গেছে। বুকে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লে, এখুনি কমে যাবে, সেরে যাবে, ভয় নেই দিদি, আপনি একটু চুপ করে শুয়ে থাকুন।

মলিনা জানে, এ ব্যথা আর সারবে না, বেলা শেষ হ'ল, এবার ভাঙার পালা। যন্ত্রণায় টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে মলিনা, অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জয়ন্তীর মুখের দিকে, এ ব্যথার অংশ নিক জয়ন্তী, তবু মনে মনে সে আর তাকে বিশ্বাস করে না। জয়ন্তী যেন আর সে জয়ন্তী নয়। সতর্ক হয়েছে বটে জয়ন্তী, তবু তার সারা অঙ্গে পুরুষ সংস্পর্শের মদির উত্তেজনা বর্ত্তমান—নারীর চোখে নারীদেহের এই বিচিত্র রহস্য নগ্ন ও স্পষ্ট হয়ে উদ্ঘাটিত হোল। তীব্র ও তীক্ষ্ণ ব্যথায় মলিনা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্ল।

কিন্তু মলিনার ব্যথা কমলে দেখা গেল, জয়ন্তী ফুলে ফুলে কাঁদছে। জয়ন্তী বল্লে, অনেকের সেবা করেছি, কর্ত্তব্য বলেই করেছি, কিন্তু আপনার কষ্ট আর দেখতে পারি না, আপনি সেরে উঠুন দিদি।

খাটের পাশে বসে মাথাটা বিছানায় এলিয়ে দিয়েছে জয়ন্তী গভীরতম বেদনায়, বিশীর্ণ আঙুল দিয়ে মলিনা সস্নেহে তার মাথার অবিন্যস্ত

চুলগুলি ঠিক করে দেয়। এ সংসারকে ভালবাসবার ক্ষমতা আজো মলিনার বর্ত্তমান, এই আনন্দেই সে আত্মহারা হয়ে রইল।

বিছানার চাদরে মুখ ঢেকে জয়ন্তী পড়েছিল, মলিনার আঙুলের শান্ত স্পর্শে জয়ন্তীর মনোভার নেমে গেল। যেন জননীর অভয়স্পর্শে নিভৃত নীড়ে সন্তান আশ্রয় নিয়েছে।

মলিনা বল্লে, তোমার কাছে যা পেয়েছি তা আমি ভুলতে বসেছিলুম। এর পর মলিনাও কেঁদে ভেঙে পড়ে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে জীবনের গতি-প্রাবল্যের ঝড়, রঙ ও লাস্য সব সে হারিয়েছে, দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরছে শরতের সোনালি রোদ, জানালার সাসীতে আছাড় খায় নদীর ঢেউ, বর্ষার বৃষ্টিধারা। আর এই নির্জ্জন গৃহকোণে রোগ শয্যায় শুয়ে আছে রোগজীর্ণা মূর্ত্তিমতী অশান্তি, মৃত্যুর নিঃশব্দ পদধ্বনি শোনবার আকুল আশায় পড়ে রয়েছে মলিনা।

যথারীতি পরদিন সকালে শশিশেখরবাবু এলেন, সেদিন মলিনাকে দেখে খুসি হলেন। এতদিনে তবু একটু আশা হ'ল। ডাক্তারবাবু চলে যাবার পর মলিনা ঘুমিয়ে পড়লো—গভীর ঘুম। দুতিন ঘণ্টা পরে ঘুম যখন ভাঙলো, তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকালে পৌঁছেছে। শান্ত হয়ে শুয়ে রইল মলিনা, নদীর গতিবিভঙ্গ লক্ষ্য করতে লাগল। উপরে অশান্ত ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস, অথচ অন্তরে নিবিড় প্রশান্তি। জয়ন্তী বলে—সেরে উঠুন দিদি, সেরে উঠতে কার না সাধ! মাটির ভিতর থেকে উদ্ভিদের উদ্ভব, তারপর একদা সেই নীলবৃন্তের কুঁড়িতে ফুল

ফোটে—সেই তার সার্থকতা, নদীর জল তট-ভূমিতে আছাড় খেয়ে আহত আনন্দে অভিভূত হয়—সেই তার সার্থকতা।

সাগরতরঙ্গের উদ্দাম উচ্ছ্বাস অন্তরে অনুভব করলে মলিনা। সেই মুহূর্ত্তেই মনে হলে যেন তার নিশ্বাস আটকে আসছে। আতঙ্কে শিউরে উঠলো মলিনা। জয়ন্তী, জয়ন্তী!

কোনো সাড়া নেই, রুদ্ধ ঘরের বাইরে পৌঁছলো না সে আওয়াজ; প্রতিধ্বনি ফিরে এলো, জয়ন্তী, জয়ন্তী!

আর একটু অপেক্ষা করলে মলিনা, কোনই সাড়া নেই। হয়ত জয়ন্তী কলঘরে আছে। খাট ধরে আস্তে আস্তে মেঝেয় নেমে এলো মলিনা, তারপর দেয়াল ধরে ধরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

ছ' মাসের মধ্যে এই প্রথম ঘর ছেড়ে বেরুলো মলিনা।

জয়ন্তী! রুগ্ন কণ্ঠে জোর নেই, অবসন্ন হয়ে মলিনা আবার ডাকলে, জয়ন্তী!

মৃত দেয়ালের গায়ে আহত হয়ে ধ্বনি ফিরে এলো। রান্নাঘরে, দালানে, কলঘরে কোথাও জয়ন্তী নেই, কেউ নেই।

মলিনার পায়ের নীচের মাটি সরে গেল। মলিনা শেষবার ডাকলে জয়ন্তী! অসীম শূন্যে মিলিয়ে গেল ক্ষীণকণ্ঠের প্রতিধ্বনি। শুধু দুরন্ত নদীর জল-কল্লোল সেই নির্জ্জন গৃহকোণে ভেসে এলো।

প্রবল হয়ে উঠলো বুকের ব্যথা, সজোরে দুর্ব্বল আঙুল দিয়ে বুকটা চেপে ধরলে মলিনা, এখনই ঘরে ফিরতে হবে, কিন্তু এটুকু পথ ফিরে যাবার ক্ষমতা তার আর নেই, কান্নায় মলিনার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো

অসহায় শিশুর মতো কাঁদতে লাগল মলিনা। কুঁড়িতেই শুখিয়ে গেল ফুল, পাপড়ি ঝরে গেল, ফোটার অবসর নেই।

বিছানার ধারে মলিনা পৌঁছতে পারলে না, দক্ষিণের জানলার ধারে ক্ষীণ মুঠীতে চেয়ারটা ধরে মলিনা বসে পড়লো, ব্যথায় যন্ত্রণায় সারা দেহ তার এখনই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

মলিনার চোখে আর জল নেই, ব্যথার যন্ত্রণায় কাঁদবারও তার শক্তি নেই, আতঙ্কের স্নায়ুকেন্দ্র থেকে ব্যথার দুঃসংবাদ প্রতিধ্বনিত হয়ে সারা দেহের স্নায়ু-শিরায় সংঘর্ষ সুরু করেছে। অসহ্য বেদনায় শতধা বিভক্ত হয়ে পড়লে মলিনার রোগজীর্ণ দেহ। বাইরে গর্জ্জন করছে বর্ষা-বিস্ফারিত নদী। কোনো সংযোগ নেই ওদের মলিনার জীবনের সঙ্গে, তবু যেন ওরা একই সূত্রে জড়িয়ে পড়েছে।

এতক্ষণে সদর দরজা খোলার আওয়াজ হ'ল, জয়ন্তী ফিরলো তাহলে, পরম নির্ভরতায় সাময়িকভাবে বেদনার তীব্রতা কমলো। অর্দ্ধ-অচেতন মলিনা নিস্পন্দের মতো পড়ে আছে।

পায়ের ধ্বনি ক্রমশঃই এগিয়ে এল,—রাণী কি খবর ?

জয়ন্তী নয় শৈলপতি ফিরলো। মুখে কথা বেরোল না, নড়বার ক্ষমতা নেই মলিনার।

শৈলপতি ঘরে ঢুকে দেখলে—চেয়ার ধরে মেঝেয় পড়ে আছে মলিনা, তার ধূসর রুক্ষ চুলগুলি পিছনে ভেঙে পড়েছে, লুটিয়ে পড়েছে তার বিস্রস্ত কাপড় আর দেহ, রক্তহীন পাংশু মুখে তীব্র ব্যথা ও অসহ্য

বেদনার চিহ্ন বর্ত্তমান। মৃত্যুর ভয়ঙ্করতা অবশেষে সেই নির্জ্জন গৃহ কোণে এনেছে পরম প্রশান্তি।

জীবন ও মৃত্যুর প্রান্তসীমায় এসে আত্মাকে অবিনশ্বর করার ব্যাকুল অনুপ্রাণনায় মলিনা মাথা খুঁড়ে মরেছে, ইচ্ছা শক্তি ও সামর্থ্য তার প্রাণহীন দেহ থেকে নির্গত হয়ে নিরাকার সান্ধ্য বাতাসে মিলিয়ে গেছে। ধূসর অন্ধকারের নিবিড় ছায়ায় হারিয়ে গেছে মলিনা—শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে প্রাণশক্তি মুক্তি পেয়েছে। আজ আর শৈলপতির নয়, মৃত্যুর স্পর্শের সমুদ্রে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে মলিনা।

ভাই-বোন

বিপুল শরীর শূন্যে নিক্ষেপ করে ভবতারণ চীৎকার করে উঠ্‌লেন, ছিঃ ছিঃ, সুরুয়ায় কি ভয়ানক নুন দিয়েছো, অ' সুরবালা, তোমাদের কি আক্কেল-বিবেচনা সব লোপ পেয়েছে ? সারা দেহ চাদরে আবৃত করে শুধু মুখখানি বার করে তীক্ষ্ণ তিক্ত কণ্ঠে ভবতারণ আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন, নুন খেলে ব্লাড্‌ প্রেসার বাড়ে, ডাক্তার যে পই-পই করে বলে দিয়েছে। তারপর চাদরটা গা থেকে সম্পূর্ণ খুলে ফেলে, হট্‌ ওয়াটার ব্যাগ, বালিশগুলো সব মেঝেতে ফেলে দিয়ে ভবতারণ অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বল্লেন—আমি মরি তাই চাও, না সুরবালা ! ভবতারণের চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

সহিষ্ণুকণ্ঠে সুরবালা বলে উঠল—ওকি কথা দাদা, সব গিয়ে তুমিই যে আমার সব ! কোনো কথা কি তোমার মুখে আটকায় না।

ভবতারণ বল্লেন—থাক্‌বে না কেন, ঢের আছে, কেন পুলিন ? কথা কটি অল্প বটে তবু তা সুরবালার অন্তরের মর্ম্মস্থলে তীব্রভাবে আঘাত করলো ! ভবতারণের অর্থসূচক দৃষ্টি সুরবালাকে পীড়িত করে। পুলিন সুরবালার স্বামীর নাম। সুরবালা শান্তকণ্ঠে বল্লে—হাঁ, ভাই-বোনের মধ্যে তুমি, আর উনি আমার স্বামী, এই আমার সম্বল।

সুরবালার কণ্ঠে করুণার আবেদন। হট্‌ ওয়াটার ব্যাগটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে ভাইয়ের পায়ের তলায় রেখে দিলে সুরবালা।

আবার লাথি মেরে হট্ ওয়াটার ব্যাগ ফেলে দিয়ে রোগশয্যা থেকে ভবতারণ বল্লেন—বল্‌বো, পুলিনকে একদিন সব বল্‌বো—

নিজের বুকটি চেপে ধরে উত্তেজিত স্থরবালা বল্লে—কখনই না, কি বল্‌বে তুমি ? ”

প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য কর্‌তে কর্‌তে আবার বল্লে ভবতারণ—একদিন কিন্তু বল্‌বো ! এই কথা চিরদিন স্থরবালাকে শঙ্কিত করে এসেছে। উভয়েরই বয়স প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় পৌঁছেচে, স্থূলকায় রুগ্ন ভাই ভবতারণ দীর্ঘকাল ধরে ধারাবাহিক অনুযোগ ও ভীতিপ্রদর্শন করে প্রায় সমবয়স্কা বোন স্থরবালাকে সশঙ্কিত করে রেখেছে। স্থরবালা ম্লানমুখে ভবতারণের রোগশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে নানাবিধ কটু কথা শুনে যায় এবং যথাসম্ভব অনুনয় করে উত্তর দিয়ে রুগ্ন ভাইটিকে শান্ত রাখ্‌বার চেষ্টা করে।

কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে একটু ইতস্ততঃ করে স্থরবালা বল্লে—এই ত' পরশু দিন যখন তোমার জন্যে স্থরুয়া তৈরী করছিলুম, তুমি বল্লে একদম আলুনী হয়েছে, নুন নেই একটুও !

—ছিল না তাই বলেছি !—তারপর মশারির দিকে চেয়ে কতকটা আত্মগত ভাবেই ভবতারণ বল্লেন—এতদিন রান্না করেও স্থরুয়ায় কতটুকু নুন দিতে হবে তাও শিখ্‌লে না, বেশীও নয়, কমও নয়, ঠিক যতটুকু দরকার। হা ভগবান্ !

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অসম সাহসে ভর করে স্থরবালা আবার বল্লে—বেশ যদি বল ত' আমি না হয় নুন না দিয়ে স্থরুয়া তৈরী করে দেব, তুমি ঠিক করে নুন দিয়ে নিও।

ভবতারণ হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন—যেমন বুদ্ধি তোমার, নুন না দিয়ে রাঁধবেন, নুন পরে মেশালে চলে না, রান্নার সময়েই দিতে হয়, সকলেই

একথা জানে, রোগীর মেটাবলিজমের ওপর তা'র কেমিক্যাল এ্যাক্সন কি হয় তা'র খবর রাখো, কিই-বা জানো, মেটাবলিজমে তোমার আর কি এসে যায়।

এই জাতীয় অনেক কথা দীর্ঘকাল ধরে ভবতারণ বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে শুনে শিখেছেন, সময় বুঝে এক-একটা অব্যর্থ প্রয়োগে সুরবালাকে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দেন।

সুরবালা তবু ভয়ে ভয়ে বলে—আমি তোমার মেটাবলি জানি।

দৃঢ়কণ্ঠে ভবতারণ বলে উঠ্‌লেন—ছাই জানো—কিচ্ছু জানো না, এতদিন শেখা উচিত ছিল অনেক কিছুই, কখনও এক লাইন খবরের কাগজ পড়ো? কত কি ঘটে যাচ্ছে তা'র খবর রাখো? তোমার এই মূর্খতার হাতেই আমার মৃত্যু হ'বে।

—সাধ করে কি আর করছি, না এ আমার ইচ্ছে! সুরবালা জবাব দেয়।

—নিশ্চয়ই সাধ করে, চেষ্টায় কি না হয়, চেষ্টা করেছ' কখনও!

ভবতারণ চীৎকারে যেন বিস্ফারিত হয়ে গেলেন, বাইরের বারান্দায় বেরালটা কুণ্ডলী পাকিয়ে রোদ্দুরে শুয়েছিল, সে একবার লেজটি উঁচু করে ভবতারণের বিছানার চারপাশে ঘুরে গেল। বাচ্ছা অবস্থা থেকে এই জাতীয় মধুর চীৎকারে সে অভ্যস্ত, কিন্তু এ' বিষয়ে তা'র অভিমত জানবার কোনও উপায় নেই। মনুষ্য-সমাজের ওপর তার যেন কতকটা অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ভাব বর্ত্তমান, তার মার্জ্জারীয় আভিজাত্যের উচ্চতায় সে এ'সব ব্যাপারের অনেক উর্দ্ধে বিচরণ করে, সুতরাং এই ব্যাপারে তার এমন নির্লিপ্ত নিস্পৃহভাব।

বেরালটিকেও সুরবালাকে নিজের হাতে খাওয়াতে হ'বে। বাড়িতে

দাসী-চাকরের অভাব নেই, তবু ভবতারণ আর বেরাল উভয়েরই পরিচর্য্যার ভার স্থরবালার হাতে, এতটুকু ক্রুটী হ'বার উপায় নেই, তা'হলেই ভবতারণ চীৎকার করে উঠ্‌বে—পুলিনকে বলে দেব!

আর এই কথাতেই স্থরবালা সচকিত হয়ে উঠ্‌তো।

পুলিন স্থরবালার স্বামী, মাঝে মাঝে এ'ঘরেই বস্‌তো, কিন্তু সে নিদ্রিত কি জাগ্রত সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাক্‌তো, তাই, এরা ভাইবোনে কিংবা বেড়াল কেউ তার দৃষ্টি-আকর্ষণের চেষ্টা করেনি। পুলিন যেন—'দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ স্থখেষু বিগতস্পৃহঃ, বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ।' পুলিন কানে একটু খাটো, ছোট কথা বড় কানে পৌঁছয় না, কাজেই কিসের যে আন্দোলন চলেছে সব সময় সে ঠিক বুঝতে পারে না—তার কানে ফোনের মতো একটা যন্ত্রের ব্যবস্থা ছিল, কানে খানিকটা গোঁজা থাকে—দু'একটা নল বুকে এসে নেমেছে, সেখানে একটা রিসিভারের মত ছোট যন্ত্র, বেশী গোলমাল হোলে পুলিন কান থেকে সে'টা খুলে নিয়ে যন্ত্রটা নামিয়ে রেখে চোখ বুজে হয় ঘুমোত, নয় ঘুমোবার ভাণ কর্‌তো।

বেলুড়ে গঙ্গার ধারে পুলিনদের মস্ত বাড়ি, এই বাড়িতেই পুলিন ভূমিষ্ঠ হয়েছে, মানুষ হয়েছে, এখন শেষ জীবনে পৌঁছেচে, এই পৈতৃক বাড়ীর সঙ্গে সে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ পেয়েছিল। এই সম্পত্তির উপর পুলিন নিজে বিশেষ কিছু যোগ করে নি কিংবা নষ্টও করেনি এক বিন্দু। পুলিন সাদাসিধে ঠাণ্ডা মানুষ, ছেলেবেলা থেকেই গোঁড়া রক্ষণশীল

প্রকৃতির, আইন ও সমাজনীতির পরিপোষক, সম্ভ্রান্ত নাগরিক। এইসব ব্যাপার ছাড়া সংবাদ-পত্রে পুলিন '*Vox Populi*' '*Pro Bono Publico*' ইত্যাদি ছদ্মনামে প্রায়ই চিঠি লেখে, এতেও তার অনেকটা সময় ব্যয়িত হয়।

বাড়িতে অন্ততঃ বারো চোদ্দখানি ঘর আছে, তবুও ভবতারণকে কেন্দ্র করে এ'ঘরটিতেই তিনটি প্রাণীর সম্মিলনস্থান, ভবতারণ একা থাকা পছন্দ করেন না, ঘরে কেউ না থাকলে তার মনে হয় তাকে জব্দ কর্‌বার একটা ষড়যন্ত্র চলেছে। বধিরতা সত্ত্বেও পুলিন এটুকু বোঝেন যে ভবতারণের রোগশয্যায় সর্ব্বদাই একটা না একটা গোলমাল লেগেই আছে। কিন্তু এর অন্তরালের ভয়ঙ্কর নাটিকা সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই, পুলিন জানে না যে এই নাটিকার প্রধানতম কেন্দ্রস্থল সে নিজে, তা'কে অনুবর্ত্তিত করেই ঘটনা-প্রবাহ চলেছে। এই পারিবারিক সন্ত্রাস-জনক ঘটনা প্রতিদিন প্রায় প্রতি ঘণ্টাতেই তা'র চোখের সামনে ঘটছে, কিন্তু সে বোঝবার শক্তি তার নেই।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে এই তিনটি বিগত যৌবন প্রৌঢ়েরা এসে পৌঁছেচেন। এর মধ্যে সুরবালার একবার কি যেন পদস্খলন হয়েছিল, ব্যাপারটা ঠিক যে কি ধরণের সে বিষয়ে অবশ্য কারুর কিছু জানা নেই, ভবতারণের সে সংবাদটুকু জানা আছে এবং শুধু এই কারণেই ভবতারণ সুরবালাকে ক্রীতদাসী করে রেখেছেন।

'পুলিনকে বলে দেব' এই কথাটুকু ভবতারণের মুখ থেকে উচ্চারিত

হ'লেই সুরবালা আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌তেন! কখনও মৃদুকণ্ঠে, কখনও সুর একটু তুলে ভবতারণ সুরবালাকে ভয় দেখান, সুরবালার সারা শরীর আতঙ্কে কণ্টকিত হয়ে উঠে, মুখখানি বিবর্ণ হ'য়ে যায়, কেননা দশ হাত দূরেই পুলিন বুদ্ধমূর্ত্তির দিকে চেয়ে নীরবে বসে আছে।

কিছুকাল ধরে, ঠিক কোন্ সময়ে, কতশো সালে সুরবালার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করেছিল এই নিয়ে ভাইবোনে তুমুল তর্ক হোত। ভবতারণ বলতেন—১২৯০ সালে চড়কের মেলায়, সুরবালা বল্‌তো—১২৯৮।

ভবতারণ বলতেন—মিথ্যে কথা বোলোনা সুরবালা, আমার বেশ মনে আছে। তোমাকে খুঁজে পাওয়া গেল না, বাবা পুলিশে খবর দিলেন, মা কাঁদতে লাগলেন, এত' সেদিনের কথা, তিনদিন পরে ওয়াটগঞ্জের দারোগার কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল, বাবা তখনই তোমাকে আনতে গেলেন।

সুরবালা কতকটা উত্তেজিত হয়েই বলে—অসুখে ভুগে তোমার মাথার ঠিক নেই দাদা, আমি তোমার ছোট বোন, একি তুমি আলোচনা করছ।

ভবতারণ বলতেন—আলোচনা কি আর সাধে করি, তোমার ব্যবহারে করি, তুমি যে চরিত্রের মেয়ে!

সুরবালা আর শান্ত থাকতে পারে না—দেখ দাদা, আমি তখন কতটুকু, তারপর আমাকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তার জন্যে কি আমি দায়ী?

—কতটুকু বৈ কি! তখন ত' তোমার বিয়ে হ'য়েছে।

—না, তার দু'বছর পরে আমার বিয়ে হোল।

—কখনই না, আমার বেশ মনে আছে, তখন তোমার বিয়ে হ'য়েছে।

—বয়স হয়েছে তোমার, সবকথা আর তোমার এখন তেমন মনে থাকে না।

—কি বয়েস হয়েছে? কত বয়েস হয়েছে শুনি? আমার চেয়ে তুমি মোটে তিন বছরের ছোট, বয়স কি আমার একলার হ'য়েছে!

—বয়স দুজনেরই হয়েছে মানি, কিন্তু দিন রাত্তির এই পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি দাদা!

—লাভ আর লোকসান, কি যে তোমার মনে আছে কে জানে? তোমরা সব করতে পার। তারপরই ভবতারণ কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে বলেন, —তোমাদের আশ্রয়ে আছি তাই যা খুসী তাই বলো।

সুরবালা ব্যস্ত হয়ে বলে—কেন, তোমাকে কি বলেছি দাদা? আমার যথাসাধ্য আমি তোমার সেবা করেছি, তাতেও তোমার—

ভবতারণ উত্তেজিত হ'য়ে চীৎকার করে উঠ্‌তো—কি আর বলবে, বুড়ো, মাথার ঠিক নেই, কত কি বল্লে, ব্যাপিকা রমণী কিনা—

—'দাদা—' বলে কেঁদে সুরবালা ঘর ছেড়ে চলে যায়। এমনই হয় প্রায় প্রতি দিন, একই কথার পুনরাবৃত্তি, একই অভিনয়।

পুলিন নির্ব্বাক চিত্তে যথারীতি সংবাদ-পত্রে চিঠি লিখে চলেছে, কখনও 'কম্যুন্যাল এওয়ার্ড', কখনও বা কংগ্রেস, তারপর যুদ্ধ ত' একটি ব্যাপক বিষয়, বিষয়ের কখনও অভাব ঘটে না; কিন্তু শান্ত হলেও

পুলিনের রাগ আছে, গঙ্গার ধারে ইদানীং একটু পায়ে-চলা পথ হ'য়েছে, তা নিয়ে পুলিনের আর উত্তেজনার সীমা নেই! চাকরদের হুকুম দিয়েছে, ওদিক দিয়ে কেউ গেলেই তাকে সোজা আমার কাছে ধরে নিয়ে আসবি। মাঝে মাঝে পূর্ব্বদিকের জানালার দিকে গম্ভীর ভাবে চেয়ে থাকে পুলিন।

সুরবালা বলে—ঐ এক খেয়াল, গেলেই বা বাপু ওদিক দিয়ে লোক, সোজা হয় তাই যায়।

ভবতারণ বলেন—হুঁ! সোজা হয়, এর ভেতর অনেক মানে আছে সুরো সে কথা ত' তোমার বোঝা উচিত।

সুরবালা আস্তে আস্তে কি উত্তর দেয় শোনা যায় না।

দুপুরে ঘুম ভেঙ্গে উঠেই পুলিনের প্রথম জিজ্ঞাসা,—ওদিক দিয়ে আর কোনও লোক টোক গিছল নাকি সুরবালা?

কতকটা সচকিত হ'য়েই সুরবালা বলে—কিসের লোক?

পুলিন একটু হেসে বলে—না অম্নিই বলছি—কোনো লোক যাচ্ছিল কি না! তারপর চেয়ারে সোজা হয়ে বসে পুলিন উৎকণ্ঠ আগ্রহে গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকে। যদি কেউ এসে পড়ে পুলিন তাকে কঠিন শাস্তি দেবে।

ভবতারণ বলেন—পুলিন যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে, আমার দিকে এমন ভাবে চেয়ে থাকে যেন ভূত দেখেছে। যারা ভূত দেখতে পায় সুরো, তারা তোমার মনের কথাও জানতে পারে। মনের অগোচর পাপ নেই সুরবালা, একটু সাবধানে থেকো।

হতাশার সুরে সুরবালা বলে—তোমার জন্য কি আমি আর কিছু ভাবতে পারবো না দাদা।

পৃথিবীর পরিবর্ত্তন ঘটেছে, পদার্থ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ব্যবসা ও বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি সর্ব্বত্র পরিবর্ত্তন ঘটেছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই দুটি ভাই-বোনের ব্যক্তিগত বিরোধের অবসান ঘটেনি। বেতার, বিমান, সিনেমা, লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু এদের ভাই-বোনের বিচার বিবেচনার কোনো পরিবর্ত্তন নেই; ১২৯০ কিংবা ১২৯৮ সালে সুরবালা গুণ্ডার কবলে পড়েছিল, রোগশয্যায় শুয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ভবতারণ কিছুতেই আর সে কথা ভুলতে পারছেন না।

সুরবালা অবশেষে বিদ্রোহ ঘোষণা কর্‌ল; এতকাল যে কথা চেপে রাখবার জন্যে ভবতারণকে সে ভয় করে এসেছে, আজ আর তার ভয় নেই! চোখ বুজিয়ে চেয়ারে পুলিন চুপ করে বসে আছে। বিড়ালটি জান্‌লার উপর নিঃশব্দে বসে আছে। বিছানায় শুয়ে ভবতারণ এপাশ-ওপাশ করছেন। সুরবালা চুপ করে বুদ্ধমূর্ত্তির দিকে চেয়ে বসেছিল। কোনো দিন সুরবালার মনে এত উত্তাপ সঞ্চারিত হয়নি। নিস্তরঙ্গ নদীর দিকে চেয়ে সুরবালা সশব্দে হেসে উঠ্‌ল, সহসা তার মনে হয়েছে ভবতারণকে আর ভয় নেই। এ'রকম আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক হাসিতে ভবতারণ উত্তেজিত হয়ে বিছানায় উঠে বসলেন, তারপর বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চীৎকার করে উঠলেন ভবতারণ—সুরবালার যে ভারী স্ফূর্ত্তি দেখ্‌ছি, হাসবার কি হোল, আমার দুরবস্থা দেখে তোমার হাসি পাচ্ছে না—?

—না—তোমার অবস্থার জন্যে হাসিনি। শান্ত কণ্ঠে বল্লে সুরবালা।

—তবে হাসছ কেন? কারণটা কি শুনি?

—তোমার, আমার, আমাদের সবায়ের কথা ভেবে হাস্‌ছি। আবার হেসে ফেটে পড়লো স্থরবালা।

রাগে উন্মত্ত হ'য়ে ভারী দেহের অর্দ্ধাংশ খাট থেকে নামিয়ে স্থরবালাকে শাসিয়ে ভবতারণ বল্লেন—

হাসি-টাসি চলবে না, ওতে আমার কষ্ট হয়, না থাম্‌লে আমি সব কথা পুলিনকে বলে দেব!

শান্ত-সমাহিত ভঙ্গীতে হেসে স্থরবালা বল্লে—বেশত' বোলো।

বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে রইলেন ভবতারণ, স্থরবালার কথা তাঁর যেন বিশ্বাস হয় না, তীক্ষ্ণকণ্ঠে ভবতারণ বল্লেন—আমাকে মেরে ফেলবে, তুমি আমার বোন!

একথার কোনও উত্তর দিলেন না স্থরবালা।

অবশেষে স্থরবালা অপেক্ষাকৃত উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লে—

কেন হেসেছি জানো, আজ আমি বুঝেছি, আমি দ্বিচারিণী নই, আসলে তুমিই চরিত্রহীন। নিজের চরিত্রের কথা তোমাকে পীড়িত করে তোলে, তাই তুমি অক্ষম আক্রোশে আমাকে এতকাল পীড়ন করে এসেছ, আর আমি তোমাকে ভয় করিনা দাদা।

বিশ্রী চীৎকার করে বিছানা থেকে নেমে পড়লেন ভবতারণ; তারপর পুলিনের কানের কাছে গিয়ে বল্লেন,—জানো, তোমার স্ত্রী, আমার বোন স্থরো, দ্বিচারিণী।

তন্দ্রার ঘোর ভাল করে কাটেনি পুলিনের—সে বল্লে হুঁ।

ভবতারণ বলতে লাগলেন—১২৯৭ সালে গুণ্ডারা ওকে ধরে নিয়ে গিছ্‌ল। উন্মত্ত উত্তেজনায় ভবতারণের রুগ্ন শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ল, কথাগুলো বলবার সময় তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল,

পুলিনের টেলিফোনের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে এক সঙ্গে এতগুলি কথা বলে ভবতারণ আর দাঁড়াতে পারলেন না, চেয়ারের পাশে বসে পড়লেন।

পুলিন আর একবার বল্লে—কার কথা বল্লে ?

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সুরবালা মনে মনে পরম প্রশান্তি অনুভব করছিল। এতদিনে তার অন্তরে শান্তি এলো।

পুলিন চেয়ার থেকে উঠে বল্লে—কি হয়েছে সুরবালা, ভবতারণ রাগ করেছে বুঝি।

ভবতারণ আবার বল্লেন—দ্বিচারিণী, সুরবালা দ্বিচারিণী !

উত্তেজনায় অবসন্ন হয়ে ভবতারণের বিপুল দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

পুলিন বল্লে সুরবালা, ভবতারণের শরীরটা বোধ হয় আবার খারাপ হোল।

অচঞ্চল সুরবালা শুধু বল্লে হুঁ ! তোমাকে যা বল্‌তে চেয়েছিল, তা' তুমি শুনতে পেলেনা বলেই রাগে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে !

পুলিন একথাও শুনতে পেলে না,—বল্লে একবার ডাক্তার বাবুকে খবর দাও।

সুরবালা বল্লে—তা, ডাক্‌ছি কিন্তু তাতে আর বোধ করি বিশেষ ফল হ'বে না।

সুরবালার কথা সত্যি হোল, ভবতারণের আর জ্ঞান হোল না।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে পুলিন বল্লে—তাইত সুরবালা, তোমার বড় কষ্ট হ'বে, একলা কি নিয়ে থাক্‌বে !

পাষাণ প্রতিমার মতো চুপ করে সুরবালা দাঁড়িয়ে রইলো।

পুলিন বল্লে—কিন্তু কি যেন বলছিল, তেমন বোঝা গেল না সুরবালা।

নদীর দিকের জানলার ধারে উদ্দেশ্যহীন উদাস দৃষ্টিতে সুরবালা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

খাঁচার পাখী

গৃহ প্রবেশের দিন থেকেই নিরঞ্জন রাসবিহারী এ্যাভিন্যুর এই ফ্ল্যাট্‌টিতে বাস করেছে। আলিপুর কোর্টে এতদিনে নিরঞ্জন যা হোক্ তবু কিছু নাম করছে, প্রয়োজনের পরিমাপে অর্থের পরিমাণও তেমন অকিঞ্চিৎকর নয়, অভাব তেমন কিছুরই নেই, শুধু যদি তার একটি ছেলে কিংবা মেয়ে থাকতো। একথা মনে মনে ভাবলেও নিরঞ্জন সুমিত্রাকে কোনদিন বলেনি, সুমিত্রা নিজেই যেন লজ্জিত হয়ে আছে, নিরঞ্জনের দুঃখ সুমিত্রার জন্য, কি ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার মধ্যেই না বেচারীর দিন কাটে।

বৈচিত্র্যের অভাবে সুমিত্রার ব্যবহার আজকাল অনেকটা যান্ত্রিক হয়ে এসেছে, যদিও তার মধ্যে আন্তরিকতার উষ্ণতার অভাব নেই তবুও কেমন যেন গতানুগতিক। কোর্টে যাবার আগে সে নিরঞ্জনকে কোট পরিয়ে দেবে, নিজ হাতে টাই বেঁধে দেবে, দরকারী কাগজপত্র এ্যাটাসে কেসে ভর্ত্তি করে হাতের কাছে গোছ করে রেখে দেবে, চুলগুলি ব্রাস করবার আগে কানের পাশ থেকে দু চারগাছা রূপালি চুলও মাঝে মাঝে সে খুঁজে বার করে, তারপর মোজা ও জুতা পরিয়ে দিয়ে তবে সুমিত্রার ছুটী। সিঁড়ি পর্য্যন্ত নিরঞ্জনের সঙ্গে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে—

যতক্ষণ না ভারী জুতার আওয়াজ মিলিয়ে যায়, ততক্ষণে সুমিত্রা জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। নিরঞ্জন হেসে বলতো সেকালে রাজারা যখন যুদ্ধে যেতেন তখন রাণীরা বীর বেশে রাজাকে সাজিয়ে দিতেন, তুমিও দেখছি তাই করলে। সুমিত্রা বলে উঠতো কোনখানটা তোমার যুদ্ধ নয় বলতো, হাকিমকে জয় করা কি সহজ নাকি, সেকালে ছিল সশস্ত্র কাটাকাটি, এখন নিরস্ত্র কথা নিয়ে অহিংস কাটাকাটি। সুমিত্রা দেখতে লাগল, বালীগঞ্জের দিক থেকে একটা ট্রাম আসছে অনেক করে নিরঞ্জনের একটু বসবার জায়গা হোল, নিরঞ্জন ওপরের দিকে তাকাবার আগেই ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম ছেড়ে দিয়েছে, ট্রাম ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণে সুমিত্রার অবসর হোল—অখণ্ড অবকাশ। সুমিত্রা ঘরে ফিরে এলো। সুসজ্জিত ঘরখানি, সুনিপুণ হাতের স্পর্শে ঘরের কোনো জিনিষটি স্থানচ্যুত হয়ে নেই, অতিথি এলে এদের পরিচ্ছন্ন পারিপাট্যে বিস্ময় প্রকাশ করতেই হবে। ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মিতভাবে সুপরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত ঘরটিকে পরিচ্ছন্নতর করবার মূলে আছে সুমিত্রার অদম্য আগ্রহ।

তারপর নিঃসঙ্গ সুমিত্রা কোনও প্রকারে স্নানাহার সেরে বসবার ঘরে ফিরে এলো। সামান্য কয়েকটি মুহূর্ত্ত অবসন্নভাবে সুমিত্রা চুপ করে বসে রইল, তারপর বেরিয়ে এলো বাইরের বারান্দায়, সেখানে ছোট বড় অসংখ্য মাটির টবে নানারকম মৌসুমী ফুলের গাছ সে স্বহস্তে বসিয়েছে, চন্দ্রমল্লিকাগুলি ফোটার সময় হয়ে এসেছে, কিন্তু পিঁপড়ের চেয়ে ছোট

ছোট একরকম পোকা গাছগুলিতে ছড়িয়ে আছে, সহজে যে ফুল ফুটবে এমন ভরসা নেই, সুমিত্রার মুখখানি সহসা ম্লান হয়ে গেল।

গাছের পরিচর্য্যা শেষ হোল—এখন নিশ্ছিদ্র মোলায়েম একটানা সুদীর্ঘ অবসর। তারপর অনেক পরে দুপুরের সোনালি রোদ গিয়ে পড়ল পার্কের একমাত্র তাল গাছটির মাথায়। ফিরিওয়ালার কলরবে আবার বড় রাস্তা মুখর হয়ে উঠল, ট্রামবাস মোটরের আওয়াজে মূর্চ্ছাহত সহরের যেন পুনর্জ্জন্ম হোল, দ্বিপ্রহরের অলঙ্ঘনীয় অলসতার আকর্ষণের হাত থেকে এতক্ষণে তার মুক্তি হোল। সহরের সঙ্গে সুমিত্রারও আবার যেন পুনর্জ্জন্ম হোল, নিরঞ্জনের ফেরার সময় ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে। মধ্যাহ্নের এই ক্লান্তিকর নিঃসঙ্গ অবসর সুমিত্রার জীবনের প্রধানতম তিরস্কার। এই বাড়ীটিতে তিনটী ফ্ল্যাট্, নীচে একটি, ওপরে দুটি, নীচেরটি বাড়ীওয়ালার জন্য বারোমাস রিজার্ভ, তিনি থাকেন বর্দ্ধমানে, কদাচিৎ অর্দ্ধোদয় কিংবা চূড়ামণি যোগে তাঁর বাড়ীর মেয়েরা কল্‌কাতায় এলে এখানে থাকেন, নইলে কর্ত্তা একাই মাঝে মাঝে দু একদিন থেকে যান ; নীচেরতলা বারোমাস খালিই থাকে, ওপরের ফ্ল্যাট্ দুটির একটিতে সুমিত্রারা থাকে, অপরটিতে যদি ওদেরই মতো কেউ এসে থাকে তবু সুমিত্রার নিঃসঙ্গতা দূর হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য এই তিন নম্বরের ফ্ল্যাট্‌টি, এতদিন হয়ে গেল এ পর্য্যন্ত একঘর স্থায়ী পরিবার এলো না, অনেক কষ্টে যদিই বা কেউ এলো বড় জোর একমাস কি দেড় মাস থেকেই তারা চলে যায়। তাই বিরক্ত হয়ে সুমিত্রা নবাগতদের সঙ্গে আলাপ করা ছেড়েই দিয়েছে, কি হবে দুদিনের আলাপে, যেন ট্রেনের আলাপ, যতক্ষণ গাড়ীতে ততক্ষণ এক মন এক প্রাণ...তারপর...

একান্ত দুঃসহ হলে সুমিত্রা রাস্তার দিকে জানালাটিতে দাঁড়ায়, নীচের

মন্থর জনপ্রবাহের আকর্ষণ বড় কম নয়, কালের বিস্তীর্ণ পটভূমিকার যেন চলমান দীর্ঘ কাহিনী, আদি নেই—অন্ত নেই—অতল পারাবার। তবু সুমিত্রা মাঝে মাঝে ভাবে যদি কেউ তিন নম্বরে আসে—এবার যারা আসবে তারা হয়ত বেশীদিন থাকতেও পারে। মাঝে যারা এসেছিল তারা ভাড়াটে বটে, ওঃ দিনগুলি কি ভাবেই না কেটেছে, কর্ত্তার আস্ফালন, গিন্নীর একঘেয়ে ঘ্যান্‌ঘ্যানানি, ছোট ছেলেদের উৎপাত, তদুপরি একটী গ্রামোফোন, একই রেকর্ডের অবিরাম পুনরাবৃত্তি, জ্যোৎস্না পুলকিত রাত্রে বেজে উঠল...'এমন দিনে তারে বলা যায়', দারুণ শীতের দিনে বাজলো "প্রখর তপন তাপে", অসহ্য। সঙ্গীত যে কতখানি কদর্য্য হতে পারে তা সেই ক'দিনেই সুমিত্রা বুঝেছিল, এর চেয়ে যেন নিঃসঙ্গ জীবন ছিল ঈশ্বরের প্রসন্ন আশীর্ব্বাদ।

ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজতে চল্লো—সুমিত্রা জড়তার ঘোর কাটিয়ে উঠে দাঁড়ালো, মধ্যাহ্নের অবসাদক্লিষ্ট মুখে স্বাভাবিক প্রসন্নতা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলো। নিরঞ্জনের কাপড়-চোপড়গুলি গুছিয়ে হাতের কাছে সাজিয়ে রাখল—ঘড়ির কাঁটা পাঁচটার গায়ে সরে এসেছে, চায়ের সরঞ্জাম ঠিক করে ষ্টোভটি ধরিয়ে সুমিত্রা উন্মুখ হয়ে রাস্তার ধারের জানালাটীতে এসে দাঁড়ালো।

চায়ের জল ফুটে গেল, কিন্তু নিরঞ্জনের দেখা নেই, টিপটে জল ঢেলে সুমিত্রা উৎকণ্ঠিত হয়ে আবার জানালার ধারে এলো, যথাসময়ে নিরঞ্জন ট্রাম থেকে নামলো। সুমিত্রার বুক থেকে যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গেল, এ সহরে বিপদের অভাব নেই, দুর্ঘটনা একটা ঘটতে কতক্ষণ। হাসিভরা মুখে নিরঞ্জনের হাত থেকে এ্যাটাসে কেসটী নিয়ে সুমিত্রা যথাস্থানে রেখে দিল।

নিরঞ্জন বল্লে—চলোনা আজ একটু বেড়িয়ে আসা যাক, পিসিমা শুন্‌লাম মনোহরপুকুরে এসে রয়েছেন ক'দিন, সংক্রান্তির আগেই আবার কাশী চলে যাবেন, যাবে ওখানে—?

সুমিত্রার অসম্মতি নেই, সারাদিনের এই নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে তবু সে একটু বৈচিত্র্য, তারপর আবার সেই চিরাচরিত প্রথায় দিন যাপনের গ্লানি, সেত আছেই...

সুমিত্রা সহসা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো, কই আজ তুমি আমার সেই অরেঞ্জ রঙের উল আন্‌লে না ত'? নমুনাটা কই, ভুলে গেছ ত', বেশ !

অনুতপ্ত নিরঞ্জনের অপরাধীর মতো ম্লান মুখ দেখে সে সহজেই ক্ষমা করলো, জীবনের গতি যেখানে মসৃণ, ক্ষমা সেখানে দুর্লভ নয়।

সেদিনও সুমিত্রা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, সহসা একটা ট্যাক্সি এসে ঠিক ওদের দরজার সামনেই দাঁড়ালো, সুমিত্রা উৎসুক ও উৎকণ্ঠ হয়ে উঠলো, ঠিক এই সময়ে সে একজনেরই প্রতীক্ষা করে, জনতার অরণ্যে অবগাহন করবার সময় এখন নয়, তবু—

ট্যাক্সি থামতেই বেরিয়ে এলো সুশ্রী সুদর্শন একটী ছেলে, বছর পঁচিশ বয়স হবে হয়ত, মুখে চোখে আভিজাত্যের ছাপ, ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্সি থেকে যে মেয়েটী নেমে পড়ল, নিঃসন্দেহে সে তার স্ত্রী, অন্ততঃ সুমিত্রার তাই মনে হলো। মেয়েটি বেশ, কেমন যেন ব্রীড়ানম্র কুণ্ঠিত তার মুখভঙ্গী, মেয়েটি সুমিত্রাকে সহজেই আকৃষ্ট কর্‌লো। কিন্তু ওরা কার কাছে এলো, সঙ্গে বিশেষ জিনিষ পত্তর নেই, ঐ কটি জিনিষ

নিয়ে কেউ বাসা বাঁধে নাকি, দারোয়ানের সঙ্গে ছেলেটীর কি যেন কথা হোল, তারপর দারোয়ানজী নিজেই হোল্ড-অল আর সুটকেশটীকে ঘাড়ে করে ওপরে উঠতে লাগলো, কতই যেন পরিচিত এই বাড়ী, মেয়েটী তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এলো। পাশের ফ্ল্যাটের দরজায় এসে হোল্ড-অল আর সুটকেশটা নামিয়ে দারোয়ানজী চাবী খুলে হুজুরদের সেলাম করলো। সুমিত্রা নির্লিপ্তভাবে রাস্তার দিকে ফিরে দাঁড়ালো।

আজ নিরঞ্জনের আসতে দেরী হচ্ছে, হয়ত কোনও মক্কেলের হাতে পড়েছে, নয়ত অরেঞ্জ রঙের উল পাওয়া যাচ্ছেনা, দোকানে দোকানে খুঁজতে নিরঞ্জনের দেরী হচ্ছে। অবশেষে সাতটার পর নিরঞ্জন ফিরলো, সুমিত্রা তখনও জানালার ধারে দাঁড়িয়ে, নিরঞ্জনের আবির্ভাব সে অনুভব করেনি, তাই নিরঞ্জন যখন তাকে জানালার ধারে আবিষ্কার করলো তখন সুমিত্রা রীতিমত লজ্জিত হয়ে পড়লো।

উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে সুমিত্রা বলল—জানো আজ আমাদের পাশে কারা এসেছে? নূতন ভাড়াটে—

—তাই নাকি! কিন্তু—

—তুমি বুঝি দেখতে পেলে না, সত্যি—ভারী ছেলে মানুষ, কি করে যে সংসার করবে কে জানে? আসবাবের ভেতর একটা হোল্ড-অল আর সুটকেশ। এই নিয়ে কি কেউ বাসা করে?

—তা হয়ত করে, ওদের অভিজ্ঞতায় তোমার এই অনাস্থার কারণ কি?

—ওটা কি, ওঃ উল এনেছো বুঝি, তাই বুঝি এত রাত হোল—আচ্ছা, কি বুদ্ধি তোমার, যখন পেলেনা সোজা বাড়ী চলে এলেনা কেন! আর একদিন ছুটীর দিনেই না হয় কিনে আন্‌তে।

—শীত চলে গেলে কি স্কার্ফ বুনবে নাকি, নভেম্বরের আজ ক'দিন হোল ?

—ভারী চমৎকার হয়েছে। প্যাকেটটা খুলে সুমিত্রা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

নিরঞ্জন হেসে বল্লে—তা চমৎকার না হয় হোল। কিন্তু নতুন ভাড়াটের গ্রামোফোন আছে কিনা দেখেছ ?

সুমিত্রাও হেসে উঠল...না না গ্রামোফোন নেই বটে তবে—সুমিত্রা সহসা থেমে গেল, লম্বা বাস্‌কোটায় কি আছে কে জানে, হয়ত মেয়েটির একটা এস্রাজ-ই আছে।

ভীত হয়ে নিরঞ্জন বল্লে—তার মানে ? তাহলে—

—না না ভয় নেই, ওদের সঙ্গে আলাপ করো না, বেশ হবে'খন !

—কেন ?

—সে তুমি ওদের না দেখলে বুঝতে পারবে না !

সুমিত্রার উৎসাহের উত্তাপ নিরঞ্জনকে স্পর্শ করতে পারলে না, রাত্রির আহারের পর সুমিত্রা আর একবার চেষ্টা করলো বটে, কিন্তু বৃথা, নিস্পৃহ নিরঞ্জনের এ বিষয়ে কোনও আগ্রহ নেই, সম্পূর্ণ অবিচলিতভাবে নিরঞ্জন শুধু নিষ্প্রাণ কণ্ঠে সুমিত্রার কথায় সায় দিয়ে গেল।

অগত্যা সুমিত্রা নিজেই নবাগতদের কথা চিন্তা করতে লাগলো। গভীর রাত্রে সহসা ঘুম ভেঙে যেতে সুমিত্রার কাণে এস্রাজের মিহি সুরের রেশ ভেসে এলো, এ সুর যে অভিজ্ঞ হাতের তা বুঝতে সুমিত্রার দেরী হোল না, কিন্তু সে মনে মনে স্থির করলো নিরঞ্জনকে কোনোদিনই এ কথা জানান হবে না।

সেদিন চন্দ্রমল্লিকাগুলিতে জল দিতে গিয়ে সুমিত্রা দেখ্‌তে পেল

ছেলেটি স্বহস্তে ঝাড়ু দিয়ে ঘর পরিষ্কার করছে, বিতৃষ্ণায় সুমিত্রার মন বিষিয়ে উঠলো, কি আশ্চর্য্য, স্ত্রী কাছে রয়েছে আর স্বামী কি না নিজে ঝাড়ু দিচ্ছে, কি দিনকালই পড়েছে !

এই বিচিত্র ঘটনাটি সেদিন সন্ধ্যায় নিরঞ্জনের কাছে গল্প করতে সুমিত্রা ভুললো না, নিরঞ্জন তাচ্ছিল্যভরে বল্লে—হাতে কাজ না থাকলে অমন অনেক স্বামীকেই ঝাড়ু দিতে হয়।

সুমিত্রা বিরক্ত হয়ে বললে—তুমি কি করে জানলে ওদের কাজ নেই।

থাকলে কি আর ঝাড়ু দিত সুমী,—কাজই করতো !

—হয়ত এখন ওঁর ছুটি, ওদের যা জামা কাপড় সেদিন দেখতে পেলুম, তাতে আমার মনে হয় ওদের বেশ সচ্ছল অবস্থা।

—তাতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই, আজকাল ক্রমশঃ-শোধ্য উপায়ে জামা কাপড়ও কেনা যায়, মাসে পাঁচটাকা করে দিলেই হোল, তাছাড়া আসল আর নকল, জাপানী কিংবা বিলাতী তুমি চিনবে কি করে !

—কিন্তু ওদের চেহারা দেখে আমার মনে হয় নকল নয়—

—হ'তেও পারে, কত রকমেরই না লোক আছে। খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই নিরঞ্জন বল্লে, অপস্রিয়মান সিগ্রেটের নীলাভ ধোঁয়াটুকু শুধু দেখা গেল।

নিরঞ্জনের কঠিন ঔদাস্যের হিমেল হাওয়ায় সুমিত্রার আগ্রহ শীতল হয়ে গেল। অগত্যা নিবিষ্ট মনে ক্রচেটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সুমিত্রা আপন মনে এই নবাগত দম্পতির সম্বন্ধে কল্পনার জাল রচনা করতে লাগলো !

তারপরদিন দুপুরে সুমিত্রার পরিচিত ডিমওয়ালার কাছে সুমিত্রা বেছে বেছে ডিম কিনছিল, এমন সময়ে মেয়েটি বেরিয়ে এলো পাশের ঘর থেকে। এই প্রথম তাকে সম্পূর্ণভাবে সুমিত্রা দেখলে, পরণে তার ফিকে আস্‌মানি রঙের সাড়ি, কপালে সিঁদুরের ক্ষীণ স্পর্শ, সুমিত্রার বেশ লাগ্‌লো—

মেয়েটি সবিনয়ে নমস্কার করে বল্‌লো—আপনি পাশেই থাকেন না?

আজ ক'দিন ধরে আপনার সঙ্গে আলাপ কর্‌বো মনে কর্‌ছি, কিন্তু কিছুতেই আর সময় করে উঠতে পারিনি।

সুমিত্রারই যেন অপরাধ, সুমিত্রা অপ্রতিভ হয়ে বল্লে—তাতে কি হয়েছে, প্রথম দুচারদিন একটু অসুবিধা হয় বৈকি!

—আসুন না আমাদের ঘরে, আপনার অসুবিধা হবে না ত'!

—অসুবিধা আর কি বলুন! সুমিত্রা যেন আত্ম-সমর্পণ কর্‌লে। মনে মনে সে আনন্দিত হোল, মেয়েটিকে যতটা দাম্ভিক মনে করেছিল, তা ভুল।

ওদের ঘরে ঢুকে সুমিত্রার মনে হোল, এমন ঘরে জীবনে যেন ও প্রথম এলো, কি বিশৃঙ্খল বিশ্রী-করেই না সব রেখেছে।

মেয়েটি বল্লে—বসুন, আপনাকে একটু চা করে দিই! জিনিসপত্র সব ছড়ান এলো-মেলো হয়ে রয়েছে।

সুমিত্রা বল্লে—এতো বেলায় আর চায়ের হাঙ্গাম কর্‌বেন না। মেয়েটি কিন্তু আপত্তি শুন্‌লে না।

এই অবসরে সুমিত্রা ওদের ঘরটি দেখ্‌তে লাগলো, সামনে একটি ছোট বেতের টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম অপরিষ্কার অবস্থায় পড়ে রয়েছে, অপরিচ্ছন্ন বিছানার ওপর দুচারখানি বই ছড়ানো রয়েছে, পাশের ঘরের মেঝেতে একটি সস্‌প্যান ও দু-চারটি কাঁচের এবং চীনে মাটির বাসন দেখা গেল, জামা কাপড় ঘরের মেঝেতেই ছড়ানো রয়েছে, বাথরুমে চৌবাচ্চার কাছে ভিজে কাপড় তখনো জড়ো করা রয়েছে। মেয়েটি যে সংসারে অনভ্যস্ত সে বিষয়ে সুমিত্রার কোনও সন্দেহ রহিল না।

মেঝের ওপর ষ্টোভ জেলে মেয়েটি চায়ের জল চড়িয়েছিল, একটু ধোঁয়া দেখা যেতেই তাতে তাড়াতাড়ি পাতা ছেড়ে দিয়েছে। বিস্মিত হয়ে সুমিত্রা বল্লে·····একি! জল ত ফোটেনি এখনও এর মধ্যেই পাতা দিলেন যে?

মেয়েটি বিশেষ লজ্জিত হয়ে পড়্‌লো, সুমিত্রা সহসা দেখল ওর চোখে জল, সুমিত্রা অপ্রতিভ হয়ে বল্লে—তাতে কি হয়েছে, ওতেও চা ভালোই হয়।

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মেয়েটি বল্লে—আমারই ভুল, আপনি ঠিকই বলেছেন এর জন্য আমিই অপরাধী, কোনোদিন এসব শিখিনি তার ফল ভোগ কর্‌ছি। কদিন দোকান থেকেই খাবার আস্‌ছিল, আজ ওঁর ইচ্ছে হোল আমার হাতের রান্না খাবেন, রেঁধেও ছিলুম, কিন্তু উনি কিছুই মুখে কর্‌তে পারেন নি, না খেয়ে বেরিয়ে গেছেন এখনও হয়ত অভুক্ত আছেন। এই পর্য্যন্ত বলে মেয়েটি অশ্রুধারায় ভেঙে পড়ল।

কিন্তু বেশী বিব্রত হোল সুমিত্রা, বেচারী সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হয়ে গেছে, আগেই ওর বোঝা উচিত ছিল এদের জীবনযাত্রার মসৃণ পথে কোথায়

বাধা পড়েছে। করুণায় সুমিত্রার মন আর্দ্র হয়ে উঠল, সান্ত্বনার সুরে বল্লে

তাতে আর কি হয়েছে, আমি আপনাকে সব শিখিয়ে দেব, আসুন আমি বিকালের খাবারের সব বন্দোবস্ত করে দিই, ততক্ষণে আপনার স্বামী এসে পড়বেন।

সুমিত্রার সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যেই সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল। মেয়েটিকে সাহায্য করতে পেরে সুমিত্রা খুসী হয়েছে।

এমন সময় জুতার আওয়াজ পেয়ে মেয়েটি তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ছেলেটি ফিরে এসেছে, হাতে তার নানা রকম প্যাকেট, সুমিত্রা বুঝলে এইবার সন্ধি, তার পক্ষে এখানে আর থাকা নিস্প্রয়োজন, কিন্তু দরজার সাম্‌নেই ওরা দাঁড়িয়ে, বেরোবার পথ নেই।

—সত্যি অনু, আমাকে মাপ করো, বড় অন্যায় হয়ে গেছে, সকালে রাগের মাথায় তোমাকে যা তা বলা মোটেই উচিত হয় নি। ছেলেটি আবেগ আকুল কণ্ঠে বললে।

অনু বোধ হয় ইসারায় কিছু বলে থাকবে, ঘরে তৃতীয় প্রাণীর উপস্থিতি এতক্ষণে ছেলেটিকে সচকিত করল।

—নমস্কার—সুমিত্রাকে উদ্দেশ করে ছেলেটি বল্লে, আপনারা পাশেই থাকেন, না? অনু—এঁকে বস্‌তে দাও।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে সুমিত্রা বল্লে—অনেকক্ষণ এসেছি, আজ আর সময় নেই।

মেয়েটি সুমিত্রাকে ঘর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

সে রাতেও সুমিত্রা নিরঞ্জনকে এ ঘটনা জানালো না, রাতে বিনিদ্র শয্যায় মেয়েটির কথাই বার বার সুমিত্রার মনে পড়্‌তে লাগলো। অদ্ভুত এই মেয়েটি, যেমন সুশ্রী তেমনই সরল ওর ব্যবহার। সুমিত্রার মায়া পড়েছে অনুর ওপর, হয়ত অনুপমা, কিংবা অনীতা ওর নাম হবে। কে জানে সুমিত্রার যদি মেয়ে থাক্‌তো সে কি অনুপমার বয়সী হোত, হয়ত কিছু ছোট হত, যাহোক এতদিনে তবু একজন সঙ্গী পাওয়া গেল, মেয়েটিকে সুমিত্রা কাজ শেখাবে, মেয়েটিকে সংসার কর্‌তে শেখাবে। নিরঞ্জনের সকল ব্যাপারেই কেমন অকারণ ঔদাসীন্য। আজ প্রথম সুমিত্রা নিরঞ্জনের ওপর রাগ কর্‌লো এবং অনুদের সব কিছুই ওর কাছে সুন্দর ও পরম রমণীয় বলে মনে হতে লাগলো।

সে রাত্রিতে কিছুতেই সুমিত্রার চোখে আর ঘুম এলো না।

পরের দিন সুমিত্রা অনুদের ঘরে যাবে কি না ভাব্‌ছে ঠিক সেই সময় মস্ত একখানি গাড়ি এসে থাম্‌লো, অতবড় গাড়ি এ পাড়ায় কেন এলো সুমিত্রা কৌতূহলী হয়ে তাই দেখ্‌তে লাগ্‌লো। চাপরাশ পরা এক আর্দ্দালী সসম্ভ্রমে দরজা খুলে দাঁড়াতেই বেরিয়ে এলেন সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, দেহটি স্থূল হলেও উজ্জ্বল, প্রশস্ত ললাটে প্রতিভার পরিচয় আছে, পাশের ফ্ল্যাটে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই অনু ও তার স্বামী এবং সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন ফ্ল্যাট থেকে, পেছনে চাকরের মাথায় সুমিত্রার পরিচিত সেই হোল্ডঅল্ ও সুটকেশ। সকলে অকুণ্ঠিতচিত্তে গাড়িতে উঠে পড়্‌লো, শুধু চকিতে অনুর চোখ সুমিত্রার মুখের দিকে পড়্‌তে সে হাত দুটি তুলে সুমিত্রাকে নমস্কার জানালে—

তারপর সেই বিরাট মোটরকারখানি রাসবিহারী এভিন্যুর জনারণ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল, সুমিত্রা ঝাপসা চোখে তার সন্ধান করতে পারলে না।

সেদিন সুমিত্রা নিরঞ্জনকে বল্লে—জানো ওরা আজ চলে গেছে। নিস্পৃহভাবে নিরঞ্জন বল্লে—বিচিত্র কি! এ আমি জান্‌তুম।

সুমিত্রা কিছু আর বল্‌তে পারল না, তার মনে বার বার অনুর মুখখানি ভেসে বেড়াতে লাগল।

সুমিত্রার নিস্তরঙ্গ নিঃসঙ্গ মধ্যাহ্ন দিনগুলি আবার বিস্তীর্ণ হয়ে উঠ্‌লো।